যায়যায়দিন

তারিখ ... 17 DEC 2008 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৬ ...

# সরকারি প্রাথমিক বৃত্তি: প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

শাকিলা নাছরিন পাপিয়া

প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার প্রথম মডেল টেস্ট চলছিল। হাজার, হাজার ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণে পরীক্ষাকেন্দ্র মুখরিত। যে শিক্ষক পরীক্ষা নিচ্ছিলেন তার রুমে পঞ্চাশজন শিক্ষার্থীর মধ্যে শুধু একজনের চেহারা ও পোশাক ছিল আলাদা। তার হাতের লেখা ও উত্তর লেখার ধরনও ছিল ভিন্ন। শিক্ষক তাকে প্রশ্ন করলেন, 'তুমি কোন স্কুল থেকে এসেছো'। শিক্ষার্থী স্কুলের নাম মনে করার চেষ্টা করে কিছুক্ষণ ভেবে একটি সরকারি স্কুলের নাম বললো।

শিক্ষক অন্যদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'তোমাকে তো ওদের মতো লাগছে না।' শিক্ষার্থী গর্ব হাসি হাসলো। অহঙ্কারের সঙ্গে উত্তর দিল, আসলে ম্যাডাম আমি কিন্ডারগার্টেনে পড়ি।

শিক্ষক ম্লান হেসে বললেন, তাই বলো! পরীক্ষা শেষে ছেলের মুখে মা ওই কথা শুনে অন্যা শিক্ষার্থীদের বললো, আমার ছেলে যে, তোমাদের মতো নয়, তা দেখলেই বোঝা যায়, আমার ছেলের চেহারাই আলাদা।

ক্ষুধা আর দারিদ্র্যের সঙ্গে জন্ম থেকেই যুদ্ধ করে বেড়ে ওঠা সমাজ ও রাষ্ট্রের নানান বঞ্চনার শিকার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছোট ছোট শিশুরা। কেন তারা বঞ্চিত, কেন প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার আগে অভিজাত পরিবারের সন্তানরা শ্রমিক শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের সঙ্গে একই কাতারে বসে পরীক্ষা দেয়, কেন এসব শিক্ষার্থী সারাবছর স্কুলে না এসেও তাদের স্কুলের নাম ব্যবহার করে- এসব ভাবনা না ভাবলেও যখন সুখী পরিবারের কোনো সন্তানের মা তাদের মুখের ওপর বলে দেয় তোমাদের সঙ্গে আমার ছেলের কী পার্থক্য- তা চেহারা দেখলেই বোঝা যায়, তখন এসব কচি শিশুর আত্মসম্মানে বাধে। হাজারো বৈষম্য আর বঞ্চনায় বেড়ে ওঠার পরও তাদের চোখে জল আসে, তারা তাদের শিক্ষককে প্রশ্ন করে, সত্যিই কী তাদের চেহারাই বলে দেয় তারা গরিব?

শহরকেন্দ্রিক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তে আসে বস্তিবাসী, রিকশাচালক, গার্মেন্ট শ্রমিকের সন্তানরা। গর্ভ থেকেই যারা সুবিধাবঞ্চিত। এসব শিশুর আগমনের প্রত্যাশায় মা-বাবা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে না। জন্মের সময় স্যাঁতসেঁতে ঘরে, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে এ পৃথিবীতে তার আগমন ঘটে। মা কর্মজীবী, তাই মায়ের বুকের উত্তাপে এ শিশুরা বড় হয় না। একটি কক্ষে সাত-আটজনের বসবাস- এমন বাসস্থলে আধ পেট খেয়ে অবহেলা আর অযত্নে বড় হয় এসব শিশু। ভোরবেলা মা চলে যান কাজে আর এরা দুই টাকা হাতে নিয়ে জন্ডিস আর টাইফয়েডের জীবাণু সংবলিত আচার খেতে খেতে প্রবেশ করে স্কুলে। ভালোবাসা আর যত্নের কোনো ছাপ থাকে না অবয়বে। পূর্ণিমার চাঁদ ঝলসানো রুটি হয়ে জ্বলজ্বল করে ক্ষুধার্ত এসব শিশুর চোখের সম্মুখে। অনেক শিশু স্কুল ছুটি পর কাজ করে কারখানা বা দোকানে। মেয়ে শিশুরা মানুষের বাসায় ঘর মোছা, কাপর ধোয়া, থালা-বাসন মাজার কাজ করে। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৯৯ ভাগ শিশুর জীবন এমনি আঁধারে ঢাকা। স্বপ্নহীন, বিবর্ণ, হতাশায় পরিপূর্ণ এদের জীবন।

অন্যদিকে কিন্ডারগার্টেন অথবা নামিদামি অভিজাত স্কুলের শিশুর জীবন সম্পূর্ণ আলাদা। অফুরন্ত ভালোবাসা আর প্রত্যাশায় তার জন্ম। যত্ন আর আভিজাত্যে তার বিকাশ। সময়মতো খাওয়া, ঘুমানো, পড়া, চিত্তবিনোদন সবই আছে জীবনে। না চাইতেই জীবনের চাওয়াগুলো পূরণ হয়ে যায়। স্বপ্নও থাকে অনেক বড় বড়। এসব চির সুখী শিশু যখন সরকারি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় বিত্তহীন, চিরবঞ্চিত শিশুদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে কৃতিত্বের হাসি হাসে, তখন প্রকৃত দরিদ্র্য কে, সে বিষয়ে প্রশ্ন থেকে যায়।

> শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র শ্রেণীর যেসব শিশু পড়তে আসে তাদের জীবনচিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। মায়েরা যখন বাচ্চা ভর্তি করতে আসেন, তখন তার বাচ্চা কোন শ্রেণীতে ভর্তি হবে- সেটাও তারা বলতে পারেন না। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'দ্যান আপনার যা মনে লয়'। এসব শিশুর অধিকাংশের বাবাই একাধিক বিয়ে করেছে। মা এবং তিন-চারজন ভাইবোন নিয়ে এদের মানবেতর জীবন। দুবেলা দু'মুঠো খাবার সংস্থানের জন্য দিন-রাত এদের ছুটে চলা।

রাজধানীর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিশুরা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় প্রতিযোগিতা করে শত শত কিন্ডারগার্টেন আর হলিক্রস, কামরুন্নেসা, আইডিয়াল, ভিকারুননিসা নুন প্রভৃতি স্কুলের শিক্ষার্থীর সঙ্গে। এসব বড় নামিদামি স্কুলের শিক্ষার্থীরা মেধা তালিকায় যখন আর স্কুলে বৃত্তি পরীক্ষা দেয়ার সুযোগ না পায়, তখন ভর্তি হয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে। এরা লেখাপড়া করে অন্য স্কুলে; কিন্তু পরীক্ষা দেয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসে। ফলে সুবিধাবঞ্চিত দরিদ্র্য শিশুরা যে বৃত্তি পেয়ে ষষ্ঠ শ্রেণীতে ভর্তি হয়ে মা-বাবাকে আর্থিকভাবে সহায়তা করতে পারতো, অথচ তারা হয় বঞ্চিত। সরকারি বৃত্তি চলে যায় বিত্তবানদের ঘরে। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতার মতো-

এ জগতে হায়, সে-ই বেশি চায়, আছে যার ভূরি ভূরি। বিত্তবান শ্রেণীর পাওয়ার ঝুড়ি পূর্ণ থেকে পরিপূর্ণ হয় আর বিত্তহীনের জন্য থেকে যায় শুভঙ্করের ফাঁকি।

অলি-গলি, যেখানে, সেখানে প্রতিবছরই তৈরি হচ্ছে কিন্ডারগার্টেন। ৫০ জন ছাত্রছাত্রী হলেই নতুন স্কুল খোলা হচ্ছে। সমাবেশের মাঠ নেই, শ্রেণীকক্ষে পর্যাপ্ত আলো-বাতাস নেই, শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ নেই, আট-দশজন ছাত্রছাত্রী আর বিশাল সিলেবাস সংবলিত বইখাতা নিয়ে শুরু হয়ে কিন্ডারগার্টেনগুলো। এসব বিদ্যালয়ের মাসিক বেতনও চমকপ্রদ। যে স্কুলের বেতন যতো বেশি, সে স্কুল ততো মানসম্মত। যদিও শিক্ষকদের বেতন সর্বোচ্চ ৫০০ থেকে ৮০০ টাকায় সীমাবদ্ধ। অবশ্য এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য আছে ২,০০০ থেকে ৩,০০০ টাকার টিউশনি। এসব বিদ্যালয়ে দেখা যায় সকাল হলে অপরূপ সাজে সজ্জিত মায়েদের উপস্থিতি। দামিদামি খাবার নিয়ে মায়েদের অপেক্ষা। টিফিনের সময় আদর-যত্ন করে কে কার বাচ্চাকে বেশি করে খাওয়াতে পারে তার প্রতিযোগিতা।

শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দরিদ্র শ্রেণীর যেসব শিশু পড়তে আসে তাদের জীবনচিত্র সম্পূর্ণ আলাদা। মায়েরা যখন বাচ্চা ভর্তি করতে আসেন, তখন তার বাচ্চা কোন শ্রেণীতে ভর্তি হবে- সেটাও তারা বলতে পারেন না। বয়সের কথা জিজ্ঞাসা করলে বলেন, 'দ্যান আপনার যা মনে লয়'। এসব শিশুর অধিকাংশের বাবাই একাধিক বিয়ে করেছে। মা এবং তিন-চারজন ভাইবোন নিয়ে এদের,মানবেতর জীবন। দুবেলা দু'মুঠো খাবার সংস্থানের জন্য দিন-রাত এদের ছুটে চলা। শিক্ষক কেবল নামে মাত্র। দ্রব্যমূল্যে উর্ধ্বগতি অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগ দেখা দিলে আচমকাই বন্ধ হয়ে যায় এসব স্কুল। ফসল ওঠার সময় শহরের শিক্ষার্থীরা স্কুল বাদ দিয়ে চলে যায় গ্রামে। খাবার সংগ্রহ করতেই যাদের মাথার ঘাম পায় ফেলতে হয়, শিক্ষা তাদের কাছে গৌণ বিষয়। সুবিধাবঞ্চিত এসব শিশুকে নিয়ে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো মুখরিত। অথচ যখন এদের সঙ্গে বিত্তবান শ্রেণীর শিশুরা প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে প্রতিযোগিতায় নামে, তখন মনে পড়ে সেই কথা- 'সত্যিই সেলুকাস, কি বিচিত্র এই দেশ!' এদেশেই সম্ভব এ রকম অদ্ভুত নিয়ম।

সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের প্রতি অনুরোধ, ক্ষুধা আর দারিদ্র্যপীড়িত অসহায় ছোট ছোট শিশুর সঙ্গে সমতার এ প্রহসন বন্ধ করুন। রবি ঠাকুরের ভাষায় 'সুখে আছে যারা, সুখে থাক তারা।' সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সঙ্গে কিন্ডারগার্টেন এবং বেসরকারি বিদ্যালয়ের সিলেবাস আলাদা। যারা আলাদা, তারা আলাদাই থাক। যাদের কিছুই নেই, তাদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় এসে 'সামান্যটুকু' নাইবা বিত্তবান শ্রেণী কেড়ে নিল। সরকারি প্রাথমিক বৃত্তি হোক শুধু সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য।

শাকিলা নাছরিন পাপিয়া: শিক্ষক।